ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 169-177
www.athenajournalcbm.in

সমাজ পুনর্গঠন যজ্ঞে গান্ধীজির ভূমিকা: একটি সমীক্ষা

স্বরাজ বক্সী* ও শর্মিলা রায়**

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ০৪.০৪.২০২৪ গৃহীত: ০৭.০৭.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্ব পাহাড়প্রমাণ। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর সমস্ত দুর্বলতা দূর করে এক বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন গান্ধীজি। তিনি অহিংসা ও সত্যাগ্রহের ওপর প্রতিষ্ঠিত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন চেষ্টা করে গেছেন। আর এই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সামাজিক পুনর্গঠন বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা, তাঁর ক্রিয়া-কলাপ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁর ভাবনা-চিন্তা এতটাই মৌলিক, তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তো বটেই এমনকি বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটেও তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক পুনর্গঠন বিষয়ে গান্ধীজির চিন্তাভাবনার কেন্দ্রস্থলে ছিল 'গ্রাম ভাবনা'। তৎকালীন সময়ের গ্রামীণ ভারতের ধারণাকে সর্বাত্মক রূপ দেওয়া এবং ব্রিটিশ শাসন-শোষণকে মনে রেখে, সমগ্র দেশের সামাজিক পুনর্গঠনে উন্নয়নের মৌলিক রূপরেখা তিনি অঙ্কন করেছিলেন। তৎকালীন 'হরিজন পত্রিকা' এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গ্রাম ভাবনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐতিহ্যশালী গ্রামীণ হস্তশিল্পের ভগ্নপ্রায় অবস্থাকে পুনরুদ্ধার করতে তিনি 'স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ' ও 'বিদেশি দ্রব্য বর্জন'—এর মাধ্যমে ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। শুধু নিয়মমাফিক প্রাণহীন কাজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক পুনর্গঠনে সর্বাত্মক সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সবকিছুকে সার্বিকভাবে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে দেশ গঠন অলীক কল্পনা মাত্র। পুরনো কুটির শিল্প ও হাতের কাজগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বাঁচিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে তিনি সমাজব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।*

সূচক শব্দ: *পুনর্গঠন, গ্রাম ভাবনা, শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, হরিজন উন্নয়ন।*

*স্টেট এডেড কলেজ টিচার, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
**এম.ফিল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: swarajbakshi5@gmail.com

সত্য, অহিংসা ও শান্তির পূজারী তথা পথপ্রদর্শক রূপে বিশ্ব দরবারে যিনি সুপ্রসিদ্ধ তিনি মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজি ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত জননেতা। কিন্তু তাঁর বহুমুখী কর্মযজ্ঞের মধ্যে যে দিকটি তুলনামূলক কম আলোকপাত করা হয় তা হলো সামাজিক পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনা, তাঁর কার্য পদ্ধতি। অথচ সামাজিক পুনর্গঠন বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা এতটাই মৌলিক, তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তো বটেই, এমনকি বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটেও তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর আদর্শ চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা অহিংস সমাজ তৈরি করা। সেই সমাজের কাঠামোর প্রকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ তৈরি—এই সকল বিষয় সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করে ভারতবাসী তথা সকল জনগণের জন্য এক নতুন পথের সন্ধান রেখে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি অনুধাবন করেছিলেন, প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে জনজীবন বেশি প্রভাবিত হয়, যা সুখ-দুঃখের সঙ্গে একান্ত ভাবে সম্পর্কিত, সর্বোপরি সমাজের সকল স্তরের আপামর জনগণ যাতে সামাজিক পুনর্গঠন কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেই কর্মযজ্ঞই সার্থক গণসংযোগ সফল ভাবে গড়ে তুলতে পারে। সামাজিক পুনর্গঠনের উপযোগিতা সেই দিক থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি। সামাজিক পুনর্গঠন গান্ধী প্রতিভার এক অনন্য নিদর্শন। সমাজব্যবস্থাকে তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মূল্যবোধ যুক্ত যেকোনো কাজকেই তিনি সামাজিক পুনর্গঠন আখ্যা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং, গান্ধীজির সামাজিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে অর্পিত হলেও এর প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ পরিবর্তন।

উক্ত প্রবন্ধে বর্ণনা এবং বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর প্রতি গান্ধীজির সেবাব্রতি, মানবিক এবং গঠনমূলক দিকসমূহ উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলী বিশ্লেষণের উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত গান্ধীজির নিজের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী এবং গান্ধীজি সম্পর্কিত অন্যান্য আকর গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধে গান্ধীজির তাত্ত্বিক চিন্তার ব্যবহারিক প্রয়োগের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাবলীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই সকল গৌণ উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হাওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সমাজ পুনর্গঠনের দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত: সামাজিক গঠনকর্ম বিষয়ে গান্ধীজি যে অব্যর্থ নিশানার অনুসন্ধান দিয়ে গেছেন তা একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে প্রমাণিত হয়, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দিল্লির অস্থির পরিস্থিতিতে সরকারকে পরামর্শ দিতে এবং উত্তপ্ত জনতাকে সামাল দিতে কলকাতা থেকে গান্ধীজিকে দিল্লি ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। গান্ধীজি তখন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায় ছিলেন এবং পরিস্থিতি তখন অনেকটা শান্ত। পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি অনুযায়ী তাঁর দ্বিতীয়বারের জন্য কলকাতা থেকে নোয়াখালী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নেহেরুর জরুরি তলবে তিনি পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি বাতিল করে দিল্লি চললেন উত্তপ্ত দিশাহীন জনজীবনকে পথ দেখাতে। গান্ধীজিকে নেহেরু জানালেন এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য। নেহেরুর বক্তব্য শুনে গান্ধীজি বলেছিলেন—তোমাকে আমি একটি মাদুলি দিচ্ছি—এইটি ধারণ করলে পথ খুঁজে পাবে, পথ চলায় ভুল হবেনা। 'মাদুলি' কথাটাই তিনি ব্যবহার করেছিলেন, অথচ এই মাদুলির কি সুগভীর তাৎপর্য তা সম্পূর্ণ কথাটিতে পরিষ্কার হয়। গান্ধীজি বললেন— "I will give you a Talisman, whenever you have in doubt or the self becomes too much with you, apply this test: recall the face of the poorest and the lowliest man you may have seen and ask yourself— will the step you contemplate to take be of any use to him? Will it restore his control over his destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually— starved millions?— Then you will see your doubt and yourself melting away."[১]

অর্থাৎ অনুসৃজনে বলা যায়, গান্ধীজি নেহেরুকে এই মাদুলির তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছিলেন, যখন মনে সংশয় তৈরি হবে এবং অহংকার প্রবল হয়ে উঠবে তখন একটা পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, নিজের দৃষ্টিতে দেখা সবচেয়ে গরীব, সব থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষটির মুখ মনে করতে এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে যে কাজের জন্য নেহেরু ভাবছেন তাতে সেই পিছিয়ে পড়া মানুষটির কোনো উন্নতি হবে কি, সেই পিছিয়ে পড়া মানুষটি কি তার অনিবার্য পরিণতির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে? অন্যভাবে বলতে গেলে এই কাজ কি দেহ ও মনের ক্ষুধা মিটিয়ে কোটি কোটি মানুষকে স্বরাজের পথে নিয়ে যেতে পারবে?—এই প্রশ্ন যদি নিজের মনে তৈরি হয় তাহলে গান্ধীজি মনে করতেন মনের সংশয় এবং অহংকারের অবসান হওয়া সম্ভব।

নেহেরু এবং তাঁর সহকর্মীদের যে 'মাদুলি' গান্ধীজি ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই মাদুলির কার্যকারিতা বা গ্রহণযোগ্যতা নিজের প্রতিদিনের জীবনে প্রয়োগ এবং তার সত্যতা যাচাই করে তিনি অন্যদের ধারণ করতে বলেছিলেন। সামাজিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সবথেকে দুর্বলতম ক্ষেত্রটি যদি সবার প্রথমে নজরে আসে, প্রতিদিনের কাজ কর্মের মধ্যে বারবার ফিরে আসে, যদি ভাবনা-চিন্তায় প্রতিমুহূর্তে প্রতিফলিত হয়— তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, সেই ক্ষেত্রে বা সমাজের সার্বিক কল্যাণের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা। অর্থাৎ, কোনো চাষী যদি তার চাষযোগ্য জমির সবথেকে দুর্বলতম চারাগাছটির প্রতি যত্নবান হয়, তাকে সার জল দিয়ে যত্ন নেয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় সেই চাষীর চাষযোগ্য জমির সমস্ত চারাগাছই সযত্ন নিরাপদ। প্রশাসনিক ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া, সবচেয়ে দুঃস্থ কোনো এলাকার উন্নয়ন সাধনে প্রশাসনিক ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যদি সবার আগে মনোনিবেশ করেন, তাহলে ধরে নেওয়া যায় সমগ্র অঞ্চলটি সম্পর্কে প্রশাসন মনোযোগী ও উৎসাহী। সুতরাং, "সবার পিছে সবার নিচে, বা সবচেয়ে পশ্চাৎ পদকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার তত্ত্বটি কোনও ভাবালুতা নয়, কোনও করুণাও নয়,—উন্নয়নের বা উত্তরণের এটাই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত নীতি ও পদ্ধতি। অর্থাৎ তা যতখানি নৈতিকতা নির্ভর ততখানি বাস্তবসম্মতও।"[২]

সমাজ পুনর্গঠনে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা ও প্রস্তাব: গান্ধীজি ছিলেন একজন উচ্চমানের জননেতা— এ বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাঁর আজীবন সাধনা ছিল অহিংস সত্যাগ্রহের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষকে বিদেশি শাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত করা এবং এর সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যেও দেশের জনগণের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার বিষয়েও তাঁকে ভাবতে হয়েছে। দেশবাসীর সামাজিক কল্যাণের কথা মাথায় রেখেই সুনির্দিষ্ট পথের দিশাও দেখিয়েছিলেন বিভিন্নভাবে, এমনকি হাতে কলমেও। স্বরাজ যেমন ছিল তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজমন্ত্র, তেমনই সামাজিক পুনর্গঠন যজ্ঞে অর্থাৎ, গ্রামোন্নয়ন, সমবায়, পঞ্চায়েত ভাবনা, স্বনির্ভরতা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত চিন্তাভাবনা ও প্রস্তাব আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গান্ধীজি সামাজিক পুনর্গঠনমূলক কর্মসূচি সত্যাগ্রহের আদর্শের পথ ধরে পরিচালনার কথা বলেছিলেন। তিনি সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক পুনর্গঠন যজ্ঞে সত্যাগ্রহীদের কিছু গঠনমূলক কর্মসূচির নির্দেশ দিয়েছিলেন—

১. কর্মসূচির লক্ষ্য হবে বেশি কাজ ও কম কথা।

২. এর কেন্দ্রস্থলে থাকবে চরকা। এলোমেলোভাবে যেকোনো জায়গায় চরকা চালালে হবেনা, এর গণিত ও যন্ত্রকৌশলসহ যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করতে হবে। কার্পাস, তার বিভিন্ন জাতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হবে।

৩. অক্ষর জ্ঞান প্রসারের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য কাজ করতে হবে বিধিবদ্ধভাবে এবং নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে।

৪. মদ, নেশার বস্তু ও জুয়া খেলার অভ্যাস বন্ধ করার কর্মসূচি নিতে হবে।

৫. স্বাস্থ্যরক্ষা, সাফাই, বিজ্ঞানের নিয়ম ও ঘরোয়া সহজ ঔষধ ও স্বল্প ব্যয়ের টোটকা ইত্যাদির প্রচারের দ্বারা লোকের রোগ-জ্বলা উপশমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতে হবে।

৭. হরিজনদের সঙ্গেও সদর্থক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।[৩]

গান্ধীজির মতে, এই ধরনের সামাজিক পুনর্গঠন বীরের অহিংসার প্রশিক্ষণের ভিত্তি এবং তা সামগ্রিক এবং অবিভাজ্য।

সামাজিক পুনর্গঠন বিষয়ে গান্ধীজির চিন্তাভাবনার কেন্দ্রস্থলে ছিল 'গ্রাম ভাবনা'। তৎকালীন সময়ের গ্রামীণ ভারতের ধারণাকে সর্বাত্মক রূপ দেওয়া ব্রিটিশ শাসন-শোষণকে মনে রেখে, সমগ্র দেশের সামাজিক পুনর্গঠনে ও উন্নয়নে মৌলিক রূপরেখা তিনি অঙ্কন করেছিলেন। তৎকালীন 'হরিজন' পত্রিকা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গ্রাম ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। হরিজন পত্রিকায় 'গ্রামোদ্যোগ' বিষয়ে তিনি লিখেছেন— "...আমরা যেসব জিনিস ব্যবহার করি, সেগুলি গ্রামে তৈরী হলেই আমরা কিনব। ...কিন্তু বিদেশি জিনিস, এমনকী শহরের বড় বড় কলকারখানায় তৈরী জিনিস দেখতে আরও ভাল হলেও গ্রামের তৈরী জিনিসকে তুচ্ছ করব না। অন্য কথায় বলতে গেলে, আমরা গ্রামবাসীদের শিল্প প্রতিভা স্ফূরণের সহায়ক হবে। ...এই প্রচেষ্টায় সফল হতে পারব, না পারব না সেই চিন্তায় কখনও আমরা ভীত হয়ে পড়ব না। আমাদের নিজেদের কালেই এমন সব ঘটনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, যে ক্ষেত্রে কাজের কঠিনতা দেখে আমরা পিছিয়ে যাইনি, কারণ জাতির অগ্রগতির জন্য সেগুলি অত্যাবশ্যক বলে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। কাজেই আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে পারি যে, ভারতীয় গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যাবশ্যক, যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, কেবল সেই উপায়েই আমরা অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটন করতে পারি এবং ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে নিজদিগকে এক বলে ভাবতে পারি, তাহলে আন্তরিকভাবে আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে ও গ্রামবাসীদের সামনে শহুরে জীবনযাত্রা না ধরে গ্রামগুলিকে আমাদের আদর্শ করে তুলতে হবে। ..."[৪] গান্ধীজির সামাজিক পূনর্গঠনের কেন্দ্র রূপে 'গ্রাম ভাবনার' এই খণ্ড উক্তি থেকে সহজেই অনুমেয় হয় যে কত গভীরে পরিব্যাপ্ত ছিলেন এই মানুষটি। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেই তাঁর বক্তব্যের যথার্থ অনুধাবন সম্ভব।

ব্রিটিশ শাসন-শোষণের যাঁতাকলে পড়ে বিংশ শতকের গোড়াতেই ঐতিহ্যশালী গ্রামীণ হস্তশিল্পের অবস্থা ভগ্নপ্রায় রূপ ধারণ করেছিল। দেশের তৎকালীন সেই বাস্তব অবস্থাকে অনুধাবন করে গান্ধীজি অভিমত দিয়েছিলেন, গ্রামীণ হস্তশিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে হলে 'স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ' ও 'বিদেশি দ্রব্য বর্জন'-এর পথ গ্রহণ করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। তাই পূর্বোক্ত মন্তব্যে গান্ধীজি গ্রামীণ শিল্প ব্যবস্থার পুনর্গঠনে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন।

সামাজিক পুনর্গঠন যজ্ঞে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত বিচারবোধের গুরুত্ব গান্ধীজি অনুধাবন করেছিলেন। শুধু রুটিনমাফিক প্রাণহীন কাজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক পুনর্গঠনে সর্বাত্বক সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সামাজিক পুনর্গঠন বা দেশ গঠনের অর্থ 'ছেঁড়া কাঁথায় তালি' দেওয়া নয়। অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সবকিছুকে সর্বাংশে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে দেশ গঠন অলীক কল্পনা মাত্র। গান্ধীজির মতে পুরনো কুটির শিল্প ও হাতের কাজগুলিকে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বাঁচিয়ে তোলার অর্থ সমাজব্যবস্থাকে পিছনে ঠেলে দেওয়া নয়। এই গ্রামীণ শিল্পসমূহকে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গড়ে তুলতে হবে—এই ছিল গান্ধীজির অভিমত। একটি নতুন অভিযান শুরুর মতোই পুনর্গঠন কার্য শুরু হবে। তাঁর মতে, শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজের গোড়া পত্তনের কাজের দিকে নজর রেখে অগ্রসর হবে সমাজ পুনর্গঠনের কাজ।

"I reject any religious doctrine that does not appeal to reason is in conflict with morality."[৫] অর্থাৎ অনুসৃজনে বলা যায়, যুক্তি ও নীতিবিরুদ্ধ ধর্মশাস্ত্রকে গান্ধীজি পরিহার করেছিলেন। যুক্তি ও নীতিকে প্রচলিত ধর্ম মতের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে তিনি পরোক্ষভাবে মানবতাবাদের জয়গান করেছেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সর্বোচ্চ মূল্যবোধ হিসাবে। সামাজিক পুনর্গঠন তথা প্রগতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ কত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। এমনকি তাঁকে প্রাণও দিতে হয়েছিল একই কারণে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন প্রচলিত পথে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, পথ খুঁজতে হবে অন্যত্র। শুধু বাইরের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নয়, মানুষের

স্বভাবের আরও গভীরে লুকিয়ে রয়েছে সমস্যার সমাধান। গান্ধীজি সার্বিক উন্নয়ন অপেক্ষা ব্যক্তির উন্নয়নের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অর্থাৎ, ব্যক্তিই ছিল তাঁর মনোযোগের মূল কেন্দ্র। তিনি বুঝেছিলেন ব্যক্তি যদি সচেতন প্রচেষ্টার দ্বারা নিজের চেতনাকে হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত করতে চেষ্টা করে, প্রেম ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তবেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব। অথচ এই পথ কঠিন, দীর্ঘমেয়াদী তা জানা সত্ত্বেও এই পথকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সুতরাং, গান্ধীজি চেয়েছিলেন মানুষের স্বভাবের রূপান্তর। যার নাম অহিংসা। অর্থাৎ মানবপ্রেম। ব্যক্তি বা সামাজিক স্তরে যতোই চেষ্টা করা হোক না কেন মানবপ্রেমের অবাধ প্রয়োগ ছাড়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

গান্ধীজির অহিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত শোষণহীন সমাজ পুনর্গঠনে সারাজীবন ধরে চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার কথাও চিন্তা করেছিলেন। গান্ধীজি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে যে ১৮ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা অন্যতম। তিনি বুঝেছিলেন দীর্ঘ সময়কাল ধরে ইংরেজ শাসনে থেকে দেশবাসীর মধ্যে যে জড়তা ও হীনমন্যতা তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন এবং তার পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। গান্ধীজির এই শিক্ষা পরিকল্পনা দক্ষিণ আফ্রিকায় 'টলস্টয় ফার্ম' থেকে মূর্ত রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে তিনি এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধায় একটি সম্মেলনে তাঁর শিক্ষা নীতি উপস্থাপন করেছিলেন। গান্ধীজি যে শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন তা কোনো লাভজনক শিল্পকে অবলম্বন করে আবর্তিত হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শিল্প কাজের দ্বারা উপার্জিত অর্থ বিদ্যালয়ে খরচের জন্য ব্যয় করবে এবং এই উপার্জনই হবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল্য। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রমের দ্বারা তাদের শিক্ষার ব্যয় বহন হচ্ছে এটা অনুধাবন করতে পারলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। এই কাজের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীরা সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি করতে এবং শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখবে।

গ্রাম পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাবনার সঙ্গে গান্ধীজি দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন অস্পৃশ্যতা বিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে। গান্ধীজির প্রার্থনা সভায় প্রত্যহ নিম্নোক্ত শ্লোকটি উচ্চারিত হত—

"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গ নাপুনর্ভবম্ ।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনং ॥"[৬]

অর্থাৎ, অনুসৃজনে বলা যায়, প্রাত্যহিক উচ্চারিত শ্লোকে গান্ধীজি বিশাল সাম্রাজ্য বা খ্যাতির শিখরে ওঠার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে করেননি। তিনি প্রার্থনা করেছেন পিছিয়ে পড়া দুঃখতপ্ত প্রাণীদের দুঃখ বিনাশের জন্য। অর্থাৎ মানবসেবায় ছিল তাঁর প্রধান ধর্ম। সামাজিক পুনর্গঠনের কাজের প্রধান অঙ্গ হলো হরিজন আন্দোলন। গান্ধীজি হিন্দু সমাজের অচ্ছুত প্রথাকে কখনোই স্বীকার করেননি। ঈশ্বরের পরম ভক্ত হওয়া হওয়া সত্ত্বেও কখনও তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেননি। কারণ, তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন মন্দিরে যতদিন হরিজনদের প্রবেশাধিকার না দেওয়া হবে ততদিন তিনি মন্দিরে যাবেন না। গান্ধীজির হরিজন আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। কারণ, বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে এই শ্রেণীকে ব্যবহার করার ফল সুদূরপ্রসারি নয়—এটা তিনি বুঝেছিলেন। আবার অন্য আঙ্গিকে হরিজন আন্দোলনের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল। তৎকালীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ পাকিস্তানের দাবিতে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় হরিজন সম্প্রদায়ও যদি নতুন কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতার হাত ধরে পৃথক রাজ্য দাবি করে বসে তাহলে তা রাজনৈতিক অপঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল হরিজনদের নিজের মুক্তির জন্য আন্দোলন। আর হিন্দু সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল ব্যাপক। সমাজের সর্বস্তরের উন্নয়ন সাধিত না হলে স্বাধীনতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদির কোনো অর্থ নেই। গান্ধীজি অপকটে স্বীকার করেছিলেন, ইংরেজরা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার যতটা ক্ষতি সাধন করেছে তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করেছে বর্ণ হিন্দু সমাজ হরিজনদের উপর অত্যাচার-অবিচারের মাধ্যমে। সুতরাং, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তুলনায় হরিজন আন্দোলন গান্ধীজির কাছে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

হরিজন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যদি অচ্ছুৎ প্রথা দূর হয় তাহলে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা বিভেদ অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব। হরিজনদের মানবাধিকার ও সম্মান সুনিশ্চিত হলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে হরিজন সম্পর্কে যে হীনমন্যতা রয়েছে তাও দূর হওয়া সম্ভব। কারণ, এই হরিজন আন্দোলন সাম্যের আন্দোলনের অংশ। সুতরাং, এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের গোঁরামির ওপর আঘাত হেনে হিন্দু সমাজে আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অথচ গান্ধীজি বর্ণপ্রথাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন সমাজে বর্ণপ্রথার কার্যকারিতা রয়েছে। কারণ, প্রত্যেক নবজাতক শিশুর গুণ, চরিত্র, শিক্ষা অনুযায়ী প্লেটোর কল্পিত রাষ্ট্রের মতো ভাগ করা সম্ভব নয়। জন্মসূত্রে প্রতিটি মানুষই তার বর্ণের গুণগত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। সুতরাং, জন্মগতভাবে প্রাপ্ত বর্ণের মধ্যেই মানুষ বিরাজ করে। গান্ধীজির বর্ণাশ্রম ধর্মে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার ও সম্মান সুরক্ষিত থাকবে। অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণের সম্মান একজন হরিজনের থেকে কোনো অংশে বেশি হবে না। কারণ, সমাজ ব্যবস্থায় সকল বর্ণের মানুষের কাজের সমান মূল্য রয়েছে সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে।

গান্ধী আদর্শে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: গান্ধীজি সামাজিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সত্যাগ্রহের আদর্শে মানবিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সমঅংশীদারিত্বে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী সমাজ বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। যে সমাজ ব্যবস্থা স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে মানবিক জীবনযাত্রার ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। সামাজিক পুনর্গঠন বিষয়ে আলোচনায় প্রথমার্ধে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধে তুলে ধরা হলো গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় ও আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত সাবেক অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা আশ্রমের অস্তিত্ব। সেই প্রতিষ্ঠান বা আশ্রমের কর্মযজ্ঞ আপাতদৃষ্টিতে জনসেবা হলেও এর প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ পুনর্গঠন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল—

১. খাদি মণ্ডল, হুগলী
২. সত্যাশ্রম, ঢাকা
৩. বিদ্যাশ্রম, ঢাকা
৪. শিক্ষা সাগর, বীরভূম
৫. খাদি প্রতিষ্ঠান, উত্তর চব্বিশ পরগনা
৬. আলোক কেন্দ্র, মেদিনীপুর
৭. খাদি মন্দির, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
৮. শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া
৯. অভয় আশ্রম, কুমিল্লা

এই প্রতিষ্ঠানগুলি গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় অবিভক্ত সাবেক বাংলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল। স্বনির্ভর সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই রকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো—

খাদি মণ্ডল, হুগলী: আরামবাগের গান্ধী বলে পরিচিত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় হুগলীর আরামবাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে খাদি মণ্ডল। সমসাময়িক বাংলার খাদি আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূরীকরণে সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানটি দৃষ্টান্তমূলক পালন করেছিল করেছিল।[৭]

সত্যাশ্রম, ঢাকা: বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বাহেড়কে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জীতেন্দ্রনাথ কুশারীর প্রচেষ্টায় সিদ্ধেশ্বরী জাতীয় বিদ্যালয়ের একটি অংশে গড়ে ওঠে সত্যাশ্রম।[৮] চরকার প্রচলনকে ব্যাপক পরিমাণে জনপ্রিয় করে তোলার পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে গান্ধীজির ভাবনার আবেদন প্রচার করাই ছিল এই আশ্রমের মূল লক্ষ্য।[৯]

বিদ্যাশ্রম, ঢাকা: ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার বানারী গ্রামে প্রথম বিদ্যাশ্রম স্থাপন করেন। গঠন কর্মের সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনও বিদ্যাশ্রম কর্তৃক পরিচালিত হত।[১০]

শিক্ষা সাগর, বীরভূম: ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুর শহরে খাদি সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালে ভারতবর্ষে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তখন গান্ধীজি ব্যাপকভাবে চরকা প্রচলনের কথা বলেন। গান্ধীজির এই মহান ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী নির্মল কুমার বসু সহ বেশ কয়েকজন নেতৃবর্গের প্রচেষ্টায় এই খাদি সংঘে গড়ে তোলা হয় 'শিক্ষা সাগর'। অল্পদিনের প্রচেষ্টাতেই এই প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত কিছু অর্থের সাহায্যে বোলপুরে চরকা তৈরি, সুতো কাটা, বোনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম দুই বছর অপরিসীম কর্মকাণ্ডের পর এই প্রতিষ্ঠান কয়েকজন কর্মী কারারুদ্ধ হন এবং এর ফলে খাদির কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেতৃবর্গের অনুপস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে কর্মতৎপরতা ক্রমশ অবলুপ্ত হয় এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করে সমস্ত চরকা, সুতো ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করে প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দেয়। স্বাধীনতার পূর্বে গান্ধীজির গঠনমূলক কর্মসূচির প্রয়াসে এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান ছিল অনস্বীকার্য।[১১]

খাদি প্রতিষ্ঠান, উত্তর চব্বিশ পরগনা: বিজ্ঞানী, জ্ঞানযোগী ও কর্মবীর ড. সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ এবং তাঁরই নেতৃত্বে ও সুদক্ষ পরিচালনায় একদিকে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও অন্যদিকে স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী সমাজ গঠন ও তার উপযোগী মানুষ গড়ার লক্ষ্যে এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ ১৯২৫ সাল থেকে এখানে শুরু হয়।[১২]

আলোক কেন্দ্র, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ডেবরা থানায় গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে আন্দোলন চলছিল তাতে কয়েকজন স্থানীয় তরুণ কর্মী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি নির্দেশিত গঠনমূলক কার্যও চালাতেন। চরকা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হরিজন উন্নয়ন, মাদক বর্জন, বয়স্ক শিক্ষা, বিরোধ মীমাংসা, হোমিও চিকিৎসা প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ চলতে থাকে নগেন্দ্রনাথ সেন, চন্দ্রকান্ত গড়াই, প্রমদাকান্ত চক্রবর্তী, ননীবালা মাইতি প্রমুখ কর্মীগণের নেতৃত্বে। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার ডেবরায় গড়ে ওঠে আলোক কেন্দ্র, তৎকালীন বাংলার সমাজ পুনর্গঠনে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।[১৩]

খাদি মন্দির, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা: ১৯২০ সালের সূচনাকালে বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর প্রচেষ্টায় সূচনা হয় খাদি মন্দিরের। বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের সময় চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী তাঁর আইন অনুশীলন পরিত্যাগ করে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের বস্ত্র স্বাবলম্বন প্রক্রিয়ায় যোগদেন এবং বিস্তীর্ণ বেশকিছু গ্রামাঞ্চলে খাদি মন্দিরের শাখা বিস্তার করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় গ্রামীণ শিল্প সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে।[১৪]

শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া: ১৯২১ সালে গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর অপর একজন অসহযোগ আন্দোলনকারী অতুলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে যৌথ প্রয়াসে পুরুলিয়ায় তেলকল পাড়ায় গড়ে তোলেন শিল্পাশ্রম, যার লক্ষ্য ছিল আশ্রমবাসীর মতো জীবন যাপন করে গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করা। গড়ে ওঠার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মানভূম অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল এই শিল্পাশ্রম।[১৫]

অভয় আশ্রম, কুমিল্লা: তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় গ্রাম পূনর্গঠনের জন্য অভয় আশ্রম ছিল একটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজির সান্নিধ্যে আসার পূর্বেই আদর্শ দেশ গড়ার কাজে নিজেদের আদর্শের উপর ভর করে মহান কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন বাংলার কয়েকজন তরুণ স্বদেশপ্রেমী। ডা: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা: প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও ডা: নৃপেন্দ্রনাথ বসুর দীর্ঘ সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯২১ সালে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই অভয় আশ্রম। এই আশ্রমের নেতৃবর্গ তাদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নবজাগরণের ঐতিহ্য এবং নতুন চিন্তা ও গান্ধীজির গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক চিন্তা শক্তি স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৬]

স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকার পাশাপাশি খাদি, চরকা, কুটির শিল্প চর্চার মধ্যে দিয়ে সামাজিক পুনর্গঠনে সহায়ক উপার্জনকারী প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলি। একইভাবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ সাবেক অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে গান্ধী চিন্তার মহান রূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল।

গান্ধীজির কাছে গ্রাম ছিল ভারতবর্ষের প্রাণ স্বরূপ। দীন-হীন, অবনত মানুষদের জন্য তিনি ছিলেন সদাব্যথিত। ভারতবর্ষীয় গ্রাম সমাজের কল্যাণকর্মে তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানে, প্রশাসন কর্মে এবং সর্বোপরি জনজীবনে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। স্বাধীনতার যখন আসন্ন প্রায়, দেশের নবজন্মের সেই পূর্ব মুহূর্তে চারিদিকে যে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল এগুলিকে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় প্রশমিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় হত্যাকাণ্ড, নোয়াখালী ও বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, পাঞ্জাবে লুণ্ঠন, হত্যা, লক্ষ লক্ষ মানুষের গৃহত্যাগের ঘটনায় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। গান্ধীজি নোয়াখালী ও বিহারের পথে পথে ঘুরে ভগবানের নাম নিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে সান্তনা ও ভরসা যুগিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পবিত্র মুহূর্তে তিনি ভারতের এক প্রান্তে কলকাতায় বসে নিরব প্রার্থনায় নত হয়ে থাকলেন। পরবর্তীতে দিল্লিতে গিয়ে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অগণিত জনগণের দুঃখ-নিরশনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ৩০ জানুয়ারি আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন গান্ধীজি। মৃত্যুর চার পাঁচ দিন আগেও তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠনে নতুন কর্মযজ্ঞের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র শাসনব্যবস্থাকে আশ্রয় করে দেশ তথা সমাজ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার পরিবর্তে সমস্ত দেশজুড়ে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সংগঠন বিস্তারের এক বিশাল কর্মযজ্ঞ দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য স্বাধীনতা পরবর্তী তাঁর নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু করার মুহূর্তে দেশবাসী তাঁর মৃতদেহের মধ্যে চিরতরের জন্য তাঁকে হারিয়ে বসেছিল। তাঁর মৃত্যু এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছিল ঠিকই, কিন্তু অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের যে বীজ ভারত ভূমিতে তিনি রোপন করে গিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও এই আদর্শকে অবলম্বন করে যে সুবিশাল কর্মজীবন এবং দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সকল দেশবাসীর কাছে পাথেয় স্বরূপ। দেহাবসানের পরবর্তীকালে মহান আত্মার মহিমা উপস্থাপিত হলো দীনেশ দাসের 'স্বর্ণভস্ম' কবিতায়। তিনি লিখলেন—

"...ভস্ম তোমার মিলিয়ে গেল স্রোতের তোড়ে
ননির মতন নরম নতুন অবাক্ পলির সৃষ্টি ক'রে
বসুন্ধরার বন্ধ্যাচরে
এবার বুঝি জীবন-সোনার ভস্ম ঝরে:
পতিত মাটি আজকে দেখি স্বপ্নরতা
আসবে ফিরে হারানো তার উর্বরতা
দিগন্ত তার উঠবে জেগে
সবুজ মেঘে।

ভস্ম তোমার বীজের মতই ছড়িয়ে গেল আকাশতলে
জলে স্থলে॥"[১৭]

সূত্র নির্দেশ:

১. সেন, মনকুমার, (১৯৯৫), গান্ধীজি ও উন্নয়নের অব্যর্থ নিশানা, *পশ্চিমবঙ্গ: মহাত্মা গান্ধী সংখ্যা,* বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২৬-৩০, পৃ. ৬৪।

২. *তদেব,* পৃ. ৬৪।

৩. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার, (২০১৩), (সম্পা.), *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ৩০২-৩০৩।

৪. *হরিজন পত্রিকা,* ২০ নভেম্বর, ১৯৩৪।

৫. *Young India,* July 21, 1920.

৬. চট্টোপাধ্যায়, রতনমণি, (১৯৯৫), গান্ধীজি, *পশ্চিমবঙ্গ: মহাত্মা গান্ধী সংখ্যা,* বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২৬-৩০, পৃ. ৪২।

৭. Prayer, Mario, (2001). *The Ghanaians of Bengal: Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942,* Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, p. 233.

৮. *Ibid.,* pp. 277-279.

৯. কুশারী, জীতেন্দ্রনাথ, (১৯৫৭), *গান্ধীজি স্মরণে,* অধ্যায়ন, পৃ. ২-৫।

১০. দে, শ্রী রাখালচন্দ্র, (১৯৬৯), *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সমাজ পুনর্গঠনে গান্ধীবাদী সংস্থা,* গান্ধী সংগ্রহালয়, বারাকপুর, পৃ. ৩৭।

১১. *তদেব,* পৃ. ৩৮।

১২. মুন্সী, সুপ্রিয়, (২০০০), স্বদেশ গড়ার কর্মশালা: সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান, *জনতার নয়া সমাচার,* বারাকপুর, পৃ. ৭-৮।

১৩. দে, শ্রী রাখালচন্দ্র, (১৯৬৯), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪১।

১৪. Prayer, Mario, (2001). *op.cit.*, p. 284.

১৫. http://purulia.gov.in/dist Admin/departments/dico/famous_person.html, Accessed 24th December, 2023.

১৬. Prayer, Mario, (2001). *op.cit.*, pp. 282-284.

১৭. দাস, দীনেশ, (১৯৯৫), স্বর্ণভস্ম, *পশ্চিমবঙ্গ: মহাত্মা গান্ধী সংখ্যা,* বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২৬-৩০, পৃ. ৮২।